ইউনিট ৮

অবস্থান, আয়তন ও ভূ-প্রকৃতি

পাঠ- ৮.১ ঃ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশের অবস্থান ও আয়তন বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের ভূ-তাত্বিক ইতিহাস জানতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দিতে পারবেন।

অবস্থান ও আয়তন ঃ প্রাকৃতিক ও ভূ-কৌশলগত বৈশিষ্ট্য

এ ইউনিটের সূচনাতেই আপনাদেরকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসর সম্পর্কে পরিচিত করতে চাই। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও আঞ্চলিকভাবে দেশটির ভূ-কৌশলগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব সমূহ তুলে ধরাই এ পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার মাঝে অবস্থিত। বহু শতাব্দী পূর্ব হতে বাঙালী অধ্যুষিত এলাকা বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। অতীতে এর সীমানা পশ্চিমে পুরুলিয়া থেকে পূর্বে কাছাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজনৈতিকভাবে, বর্তমানে এর কিছু অংশ ভারত এবং বাকী অংশ বাংলাদেশের অন্তভূর্ক্ত। বাংলাদেশের বর্তমান সীমানা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পূর্বাংশ হিসাবে (পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল) পাওয়া গেছে ; যা ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

অবস্থান ও আয়তন

আয়তন ঃ ১৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.
উপকূলের দৈর্ঘ্যে ঃ ৬০০ কি.মি.
অবস্থান ঃ ২০°৩৫′-২৬°৪২′ উত্তর
৮৮°০৩′-৯২°৩৬′ পূর্ব

ভৌগোলিকভাবে ২০°৩৫′ থেকে ২৬°৪২′ উত্তর অক্ষাংশে এবং বাংলাদেশে ৮৮°০৩′ থেকে ৯২°৩৬′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের দক্ষিণভাগ বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত। তবে এর পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ (বর্তমানে নাম বাংলা), উত্তরে আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ত্রিপুরা এবং দক্ষিন পূর্বাংশে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ ঘিরে আছে। দেশটি উত্তর-দক্ষিনে ৮২০ কি.মি. বিস্তৃত এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৬০০ কি.মি. প্রসস্ত। এর পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্বে ২৪০০ কি.মি. ব্যাপী ভারতীয় ভূ-সীমান্ত এবং দঃ পূর্বাংশে প্রায় ১৯৩ কি.মি. ব্যাপী মায়ানমারের সাথে স্থল ও নৌ সীমানা গড়ে উঠেছে। দক্ষিনে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় সীমানা, যা অত্যন্ত অসমান এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০০ কি.মি. ব্যাপী। এ দীর্ঘ উপকূলের অসংখ্য ছোট-বড় নদী-নালা বঙ্গোপাসরের গিয়ে মিশেছে। বাংলাদেশের নৌসীমানা উপকূল থেকে সমুদ্রের ১২ কি.মি. পর্যন্ত এবং দেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমানা (Exclusive Economic Zone) ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের মোট আয়তন১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.। বর্তমানে নদীতে এবং বঙ্গোপ সাগরে চর জেগে ওঠায় এই সীমানা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষুদ্রায়তনের একটি দেশে ১২০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৪ কোটির ও অধিক লোক বসবাস করায় দেশটি পৃথিবীর অন্যতম ঘণবসতির দেশ হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কি?

সমতল ভূমি - ৮০%
পাহাড়ী ভূমি - ১২%
উচুঁ সোপান - ৮%

প্রাকৃতিকভাবে দেশটির মূল অংশ একটি প্লাবন সমভূমি শতকরা ৮০ ভাগ, মাত্র ১২ শতাংশ উচু পাহাড়ী ভূমি এবং বাকী ৮ শতাংশ প্লাবন ভূমির চাইতে উঁচু সোপান নামে পরিচিত। পাহাড়ী ভূমি মূলতঃ দেশের দক্ষিণ পূর্বাংশ, পূর্বাংশের অংশ বিশেষ ও উত্তরাংশে মেঘালয়ের কোল

ঘেষে অবস্থিত। অতীতে এ দেশের (অবিভক্ত বঙ্গ নামে থাকা অবস্থায়) উত্তর পশ্চিমাংশ বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। তাছাড়া, দক্ষিণ পশ্চিমাংশ, যা পদ্মা ও মেঘনা দ্বারা উত্তরে ও পূর্বে সীমায়িত তা বঙ্গ নাম অবহিত হত এবং মেঘনার অববাহিকা অঞ্চল অর্থাৎ উত্তরে সিলেট থেকে মেঘনা মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গভূমিকে সমতট বলা হত। এছাড়া, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যবর্তী অংশ কেন্দ্রীয় অঞ্চল হিসাবে খ্যাত ছিল। উত্তর পশ্চিমের বরেন্দ্র ভূমি বর্তমানে তেমন প্লাবন হয় না এবং এ এলাকার নদী সমূহ গতিপথ পরিবর্তন করায় বেশীর ভাগ স্রোতধারা ক্ষীণকায় হয়ে গেছে। তবে, এ অঞ্চলের তিস্তা, ধরলা ও ব্রহ্মপুত্র-যমুনা প্রতিবছর বিপুল জলরাশি পলিসহ পতিত হয়ে ভূখন্ড গঠন করেছে যা বঙ্গোপসাগরের বদ্বীপের অংশ বিশেষ। দক্ষিণের গাঙ্গের বদ্বীপ পশ্চিমে ভারতীয় ভাগিরথী ও পূর্বে পদ্মা নদীর দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়ায় এ অংশকে মৃতপ্রায় হিসাবে দেখানো হয় এবং পদ্মা - আড়িয়াল খাঁ নদীর মধ্যবর্তী অংশের নদী সমূহ বেশ নাব্য তাই এ এলাকা সক্রিয় ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। সক্রিয় ও মৃতপ্রায় অংশের দক্ষিণের অংশ নিয়মিত জোয়ারভাটা প্রবাহিত, এর নাম পরিণত ব-দ্বীপ। ব-দ্বীপ অংশের ভূমি খুবই সমতল। তাই কৃষির জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া, প্রচুর নদ-নদী থাকায় ঐতিহাসিকভাবে উপকূলীয় এলাকায় যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে নৌপথের খুবই গুরুত্ব ছিল।

প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের প্রধান ভাগ কয়টি?

নদী ব্যবস্থাভিত্তিক বাংলাদেশকে ৪টি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়। যথা- গঙ্গা-পদ্মা, যমুনা-ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কর্ণফুলী-সাঙ্গু অববাহিকা। এসব নদী অববাহিকার সম্মিলিত আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গ কি.মি. তবে, এ আয়তনের মাত্র ৭ ভাগ বাংলাদেশ সীমানায় অবস্থিত। এসব অববাহিকার প্রধান নদী সমূহ মূলতঃ উজানে ভারতীয় সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে পতিত হয়। তাই, বাংলাদেশের পানি সম্পদের আন্তর্জাতিকতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, এদেশের কৃষি, ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও নদী সমূহের নাব্যতা ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নয়ন বহুলাংশে ও সমস্ত নদীর স্থিতিবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, তিন দিকে ভারতীয় ভূ-খন্ড দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হওয়ায় কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে একটি ভূ-সেতু হিসাবে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষকরে, আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের নৌ, সমুদ্র ও স্থল বন্দরের মাধ্যমে যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্পন্ন করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে, যা বর্তমানে স্বল্প মাত্রায় চলছে। একইভাবে ভূ-আবদ্ধ নেপাল বাংলাদেশের খুবই নিকটে (৩০ কি.মি. এর কম) হওয়ায় খুব সহজেই ভারতীয় অংশ পেরিয়ে বাংলাদেশের মংলা সমুদ্র বন্দরের ব্যবহার সম্ভব, যা উভয় দেশের সমবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের প্রধান নদী অববাহিকাগুলো কি কি?

আঞ্চলিকভাবে অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার মাঝে সেতু বন্ধন হিসাবে কাজ করছে। আশা করা যায়, বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রস্তাবিত এশিয়া মহাসড়ক ও ট্রান্স এশিয়ান রেল নির্মাণ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ যর্থাথভাবে পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার প্রবেশপথ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অর্ন্তগত একটি ছোট দেশ। দেশটি পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলির অন্যতম, ভূ-প্রকৃতিগতভাবে ৪টি প্রধান নদী অববাহিকায় দেশটি গঠিত। প্রতিবেশী দেশ, ভারত এর পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব সীমানা ঘিরে আছে, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। প্রধান নদী সমূহের উৎস বাংলাদেশের বাহিরে, ফলে পানি সম্পদের ওপর এদেশের নিয়ন্ত্রণ সীমিত।

৮.১.১ ঃ ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস ঃ টারসিয়ারী ও প্লাইষ্টোসিন যুগের আলোকে

গত পাঠে আপনারা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিসর ও ভূকৌশলগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। আজ বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে জানবেন। বিশেষতঃ বাংলাদেশের বর্তমান ভূগঠন কাঠামোর অতীত ইতিহাস, কি পরিবেশ এর সৃষ্টি তা তুলে ধরা হবে।

> ৭ কোটি থেকে ৬ কোটি বছর পূর্বে বর্তমান রম্পুরের নিকট সমুদ্র উপকূল ছিল এ সময় বঙ্গ অববাহিকা পলি ভরাটের কারণে সমুদ্র থেকে জেগে উঠে।

বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস বলতে এর গঠন কাঠামো, পলি সঞ্চায়ন ও গঠন পর্যায় সমূহকে বুঝায়। এর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ভারতীয় ভূখন্ড গন্ডোয়ানার সাথে জড়িত। গন্ডোয়ানা ভূমি থেকে আলাদা হওয়ার পর ভারতীয় প্লেট-ইউরেশিয়ান প্লেটের সহিত সংঘর্ষে হিমালয় পর্বত মালার উত্থান হয়। বর্তমান যে অবস্থানে বাংলাদেশ মনে করা হয় এখানে তখন সমুদ্র বিরাজ করছিলো। পেলিওসিন (৭ কোটি বছর) ও ইয়োসিন (৫-৬ কোটি বছর যুগে সমুদ্র উপকূল রম্পুরের দক্ষিণে গাইবান্ধার নিকটবর্তী ছিলো বলে ধারণা করা হয়। হিমালয়ের উত্থান এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুন ভূমিক্ষয়ের কারণে বিপুল পরিমান পলি নদ-নদী দ্বারা বাহিত হয়ে এ উপকূল বরাবর জমা হতে শুরু করে। এভাবে বঙ্গ অববাহিকা ভরাট হয়ে সমুদ্রের উপরে উঠে আসে। বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা -

(ক) বঙ্গ অববাহিকার জন্ম ও সমুদ্র গ্রাস,
(খ) বদ্বীপীয় পরিবেশে পলিসঞ্চয়ন,
(গ) সমুদ্রের প্লাদপসারন ও
(ঘ) কোয়াটারনারী যুগের পরিবেশে পরিবর্তন।

(ক) বঙ্গ অববাহিকার জন্ম ও সমুদ্র গ্রাস

> প্রায় ৪ কোটি বছর আগে বঙ্গ অববাহিকা আবার সমুদ্রে ডুবে যায়

ইয়োসিন যুগে অর্থাৎ ৫-৬ কোটি বছর পূর্বে পলল সঞ্চয়নের মাধ্যমে আসাম ও বার্মিজ অববাহিকার মধ্যে কিছু ছোট ছোট দ্বীপ জন্মলাভ করে। এ সময়ের শেষভাগে ‘ইষ্ট বেঙ্গল রিজ’ নামক একটি বালুকাময় উচ্চ ভূমি দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব লাইন বরাবর আসাম ও বঙ্গ অববাহিকার মাঝে সমুদ্রে জমা হতে থাকে (চিত্র ৮.২.১)। অলিগোসিন (প্রায় ৪ কোটি বছর) সময় পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গ অববাহিকা সমুদ্রের নীচেই ছিলো। দ্রুত ভরাট হওয়ার ফলে অববাহিকার গুলোর গভীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। এ সময়ে অসংখ্য নদী সমুদ্রে এসে মিলিত হয়। নদী বাহিত পলি অববাহিকায় পলল পাখার মত ছড়িয়ে যায়।

> ইয়োসিন যুগে বঙ্গ অববাহিকার পরিবেশ কেমন ছিল?

অলিগোসিন সময়ে বঙ্গ অববাহিকা ভূ-আন্দোলনগত কারণে ঢেবে যায়। বাংলাদেশের অবস্থানে প্রচুর পলি জমা হয়। ধারণা করা হয় পলি সঞ্চয়নে এ প্রক্রিয়া এ অঞ্চলে ২.৫ কোটি বছর পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে।

(খ) ব-দ্বীপীয় পরিবেশে পলি সঞ্চয়ন

> প্রায় ২.৫ কোটি বছর আগে বাংলাদেশের পাহাড় সমূহের পলি সঞ্চয়ন কাজ শুরু হয়।

এ সময়ে একটি বদ্বীপ পরিবেশে বঙ্গ অববাহিকায় পলি সঞ্চয়ন অব্যাহত থাকে। একই সাথে প্লাদ ভাগে অবিরাম ভূমির উত্থান চলতে থাকে। বদ্বীপীয় পরিবেশে নদী সমূহ স্বভাবতঃই দিক পরিবর্তন করতে থাকে এবং উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় উপকূলে গরান (Mangrove) জন্মায়।

মায়োসিন (২.৫ কোটি বছর) পরবর্তী সময়ে আরাকান ইয়োমা ও হিমালয় পর্বতমালা থেকে প্রচুর পরিমাণে পলি বঙ্গ অববাহিকায় জমা হতে থাকে। বিভিন্ন পাললিক স্তরায়ন ও তাদের অসংস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে এ সময় একাধিকবার ভূ-আন্দোলন প্রক্রিয়া কাজ করেছে। এ সময়ে বাংলাদেশের বর্তমান চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকার গোড়া পত্তন হয়।

মায়োসিন যুগের শেষভাগে বঙ্গ অববাহিকার সবচেয়ে গভীরতম অংশ সুরমা অববাহিকায় (বর্তমান সিলেট) সমুদ্রতল স্ফীতির প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়। অন্যদিকে গাইবান্ধা এলাকায় যেখানে পূর্বে উপকূলীয় পরিবেশ বিরাজ করত সেখানে সমুদ্র সংকোচন দেখা যায়; ফলে ভূমি ক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। বাকী পুরো অববাহিকায় লবনাক্ত ও স্বাদু পানির মিশ্রণ ঘটত।

মায়োসিন যুগে বঙ্গ অববাহিকার পরিবেশে কি পরিবর্তন আসে?

(গ) সমুদ্রের প্লাদপসারন

প্লায়োসিন যুগে বাংলাদেশের পাহাড়ী ভূমির সৃষ্টি হয়।

প্লায়োসিন (১.৩ কোটি বছর) যুগের শুরু থেকেই বদ্বীপের পরিবেশ এ ক্রমান্বয়ে নদীজ পরিবেশ রূপ নিতে থাকে। সমুদ্র ক্রমশঃ দক্ষিণে সরে যেতে থাকে। উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যথাক্রমে হিমালয় পর্বতমালা ও ইন্দো-বার্মান পার্বত্যাঞ্চল হতে পলি প্রবাহিত হতে থাকে। এ সময় বালুকারাশি প্রধানতঃ নদীজ কিংবা বদ্বীপীয় পরিবেশে সঞ্চিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীতে এ বালি স্তরের ওপর কর্দম জমা হয় এবং ভূ-আন্দোলন গত পরিবর্তন ও পার্শ্বচাপের ফলে চট্টগ্রাম, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম তথা উত্তর পূর্বাংশ জুড়ে পাহাড়ী ভূমির সৃষ্টি হয়।

(ঘ) কোয়ার্টারনারী (প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বের) পরিবেশ ও পরিবর্তন

প্লাইস্টোসিন যুগে বঙ্গ অববাহিকা বরফে ঢাকা ছিল।

কোয়াটারনারী যুগে বঙ্গ অববাহিকা প্রথমে বরফে ঢেকে যায়, পরে সমুদ্রে প্লাৎপসারন ঘটে থাকে। এ সময় সমুদ্রের প্লাদপসারন ও বাংলাদেশের মধ্যবর্তী অংশে প্লাইষ্টোসিন (৮-১০ লক্ষ বছর) সোপান সমূহ সৃষ্টি হয়।

প্লাইষ্টোসিন যুগের শুরুতে বঙ্গ অববাহিকার সীমানা বরাবর ছোট ছোট পলল পাখা ও বদ্বীপীয় পরিবেশের পলি সঞ্চয় একক থেকে ধারণা করা হয় যে, সে সময় সমুদ্র তল অনেক উচুঁতে ছিল। একাধিক বার সুদ্রতলের পরিবর্তনের ফলে একাধিক মৃত্তিকা স্তর দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গ অববাহিকার কোথাও কোথাও এ পলল স্তর ৬০ মিটার পুরু। প্লাইষ্টোসিন যুগে সমুদ্র তল প্রায় ১৩০ মিটার নিচে নেমে যায়। ফলে, উপকূল অঞ্চল তথা তটরেখা প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে সরে যায়। কেবল মাত্র 'সোয়াশ অব নো গ্রাউন্ড' এলাকা দিয়ে তখন পদ্মানদীর ধারা সমুদ্রে প্রবাহিত হত বলে ধারণা করা হয়। প্রায় ৬০০০ বছর আগে সমুদ্রতল সর্বোচ্চে পৌঁছে বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। সমুদ্রের তটরেখা তখন বর্তমান অপেক্ষা আরো উত্তরে চলে আসে। ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা তটরেখা তখন ঢাকা শহরের নিকটবর্তী ছিলো।

বাংলাদেশের পূর্বভাগে লালমাই, বদ্বীপীয় সমভূমি এবং চান্দিনা সমভূমি অর্ধচন্দ্রাকৃতির। পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধাপের মত ঢালু। ধারণা করা হয়, লালমাই প্লাইষ্টোসিন যুগের মধুপুর ও বরেন্দ্র ভূমির সমসাময়িক; চান্দিনা সমভূমি হলোসিন যুগের (অতি সাম্প্রতিক কালের) প্রথমভাগের এবং মেঘনা সহ অন্যান্য (পদ্মা-যমুনা) বৃহৎনদীর প্লাবন ভূমিগুলো পরবর্তীতে অর্থাৎ হলোসিন যুগের শেষভাগে সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে সমুদ্র সংযোগ দক্ষিণে সরে গিয়ে বর্তমান অবস্থানে এসেছে। প্রতিনিয়ত পলি সঞ্চয়নের ফলে উপকূলে ভূমি গঠন অব্যাহত থাকায় সমুদ্র স্ফীতি যদি না ঘটে তবে তা ক্রমশঃ দক্ষিণে সরে যাবে যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য সুসংবাদ।

কোয়ার্টারনারী যুগে বঙ্গ অববাহিকার পরিবেশের কি পরিবর্তন হয়?

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসকে ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথাঃ বঙ্গ অববাহিকার গোড়াপত্তন, বদ্বীপীয় পরিবেশ সৃষ্টি, সমুদ্রের প্লাদপসারন ও কোয়ার্টারনারী যুগের পরিবর্তন। পেলিয়োসিন থেকে অলিগোসিন যুগের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান অংশ বঙ্গ অববাহিকা সমুদ্রের নীচে ছিল। প্লাইয়ো-মায়োসিন যুগে বাংলাদেশের পাহাড় সমূহের উৎপত্তি ঘটে। প্লাইস্টোসিন যুগে বাংলাদেশের মধুপুর, বরেন্দ্রভূমি ও লালমাই সোপান সমূহ গড়ে উঠে। বাংলাদেশের বাকী প্লাবনভূমি অতিসাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১.১। বাংলাদেশের অবস্থান কত ?

ক) ৪০° ২৪′ ৪০″ থেকে ৪২° ৫২′ ৩০″ উত্তর অক্ষাংশ
এবং ৮০° ৪০′ ০০″ থেকে ৮৫° ০০′ ৫০″ পূর্ব দ্রাঘিমা।

খ) ২০° ৩৫′ থেকে ২৫° ৪২′ উত্তর অক্ষাংশ
৮৮° ০৩′ থেকে ৯২° ৩৬′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

গ) ৫০° ৩৪′ ০০″ থেকে ৫২° ৪২′ ৫০″ উত্তর অক্ষাংশ
এবং ঘ) ২০° ৩৭′ ৪২″ থেকে ২২° ৪৮′ ৪২″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

১.২। বাংলাদেশের মোট আয়তন কত কি. মি. ?

ক) ১,৪৭,৫৭০ ব. কি. মি. খ) ১,৪০,০৩৮ ব. কি. মি. গ) ১,৩৯,৩২০ ব. কি. মি.

১.৩। নদী ব্যবস্থা ভিত্তিক বাংলাদেশকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ?

ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি

১.৪। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল ?

ক) ৪০০ নটিক্যাল মাইল খ) ২০০ নটিক্যাল মাইল গ) ১৫০ নটিক্যাল মাইল।

১.৫। বাংলাদেশে অবস্থান কোথায় ?

ক) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় খ) দক্ষিণ এশিয়ায় গ) পূর্ব এশিয়ায়

উত্তরঃ ১.১। খ ১.২। ক ১.৩। খ ১.৪। খ ১.৫। ক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান লিখুন।
২. প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের প্রধান ভাগ কয়টি এবং কি কি?
৩. বাংলাদেশের প্রধান নদী অববাহিকা গুলো কি কি?
৪. কোয়ার্টনারী যুগে বঙ্গ অববাহিকার পরিবেশের কি পরিবর্তন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. টারশিয়ারী ও প্রাইয়েস্টোসিন যুগের আলোকে বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস আলোচনা করুন।

পাঠ- ৮.২ ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

ইতিপূর্বে আপনারা বাংলাদেশে ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। ভূতাত্ত্বিক পরিবেশের সাথে ভূ-প্রকৃতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। এ পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি কি ধরনের এবং তা কেমন ভূপরিবেশ গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারনা দেওয়া হবে।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা পাহাড় সোপান ও প্লাবনভূমি।

বাংলাদেশ সামগ্রিক অর্থে একটি প্লাবন সমভূমি। সমুদ্র সমতল থেকে এদেশের প্রায় ৩০ শতাংশ ভূমি মাত্র ৩ মিটার উচুঁ এবং প্রতিবছর প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ ভূমি প্লাবিত হয়ে থাকে। এদেশের প্রান্তভাগ পাহাড়ী এলাকায় গঠিত। এ সব পাহাড়ী চড়াই-উৎরাই, ও স্বল্প উচ্চতার টিলা সমূহ সমভূমিতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিরূপ। ভূমিরূপের বয়স, গঠন প্রকৃতি ও পরিবেশ এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যার মধ্যে প্লাবণভূমি প্রায় ৮০ ভাগ স্থান দখল করে আছে। বাকী ২০ ভাগ প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান এবং দক্ষিণ পূর্বাংশের পাহাড়ী অঞ্চলের অন্তর্গত। প্লাবণভূমি মোটামুটিভাবে সমতল, তবে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে খুব সামান্য নতি সহ ঢালু। বিস্তৃর্ণ প্লাবণ ভূমিকে গঠন পরিবেশের ভিত্তিতে আরো কতগুলো উপভাগে ভাগ করা যায়। এ সব উপভাগ নিম্নরূপ ঃ

(১) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়ী ভূমি

(২) প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান

(৩) সাম্প্রতিক কালের প্লাবনভূমি

- (৩.১) তিস্তা পলল পাখা
- (৩.২) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র -মেঘনা সমভূমি
- (৩.৩) হাওড় অঞ্চল
- (৩.৪) মৃতপ্রায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ
- (৩.৫) সক্রিয় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ
- (৩.৬) ত্রিপুরা সমভূমি
- (৩.৭) উপকূলীয় সমভূমি

চিত্র ৮.১ ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

(১) টারশিয়ারী (২.৫ কোটি বছর) যুগের পাহাড়ী ও টিলা সমূহ

> পাহাড় ও টিলা নিয়ে টারশিয়ারী যুগের ভূভাগ গঠিত। পাহাড়গুলো উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি অবস্থিত। এবং ঢেউ খেলানো

সিলেটের উত্তর ও পূর্বাংশ এবং চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল সমূহ নিয়ে এ এলাকা গঠিত। জামালপুরের উত্তর সীমান্ত শিলং মালভূমির পাদদেশে সুষাং টিলা সমূহ অবস্থিত। টিলাগুলোর সর্বাধিক উচ্চতা ৯২ মিটার; পক্ষান্তরে মাঝখানের উপত্যকাগুলি ও সমুদ্র সমতল থেকে ৩১ মিটার উচুঁতে। সিলেটের পাহাড় সমূহ চারটি মালায় বিভক্ত। খাসিয়া ও জৈন্তা পাহাড় সিলেটের উত্তর সীমান্ত বরাবর, সুনামগঞ্জে পাহাড়গুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ভোলাগঞ্জের নিকট পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৫২ মিটার। হারারগজ পাহাড় ৩৩৭ মিটার উচুঁ যা সিলেটের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত।

দক্ষিণ পূর্ব বাংলাদেশের পাহাড় সমূহকে মাঝখানে বিশাল উপত্যকা দিয়ে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ পশ্চিম ভাগের পাহাড়ী এলাকা ও পূর্বভাগের পাহাড়ী অঞ্চল। পাহাড় সমূহ উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে ছড়িয়ে আছে।

পশ্চিমভাগের পাহাড় সমূহ সিতাকুন্ড ও মারা টং এর সমন্বয়ে গঠিত। সিতাকুন্ড পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৩৫২ মিটার অন্যদিকে মারা টং এর সর্বোচ্চ উচ্চতা ১১৩মিটার। পাহাড় সমূহের উচ্চতা উত্তরদিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। স্থানীয়

নদীনালা সমূহ এ সব পাহাড় দ্বারা প্রভাবিত। সিতাকুন্ড হতে পাহাড় প্রায় সমুদ্র উপকূলর সন্নিকটে এবং সমান্তরালে সম্প্রসারিত হয়ে টেকনাফে গিয়ে সর্বশেষে সমভূমিতে মিশেছে।

পূর্বভাগের পাহাড়সমূহ ঢেউ খেলানো ও খাড়াঢাল সমৃদ্ধ; পাহাড়ের গড় উচ্চতা ৩০০ মিটার। এ এলাকার পাহাড়ী নদীগুলো অস্থায়ী প্রকৃতির উচ্চ ঢাল বিশিষ্ট; ফলে বৃষ্টিপাতের সাথে সাথেই নিম্নঢালে নদী প্রবাহ নামতে শুরু করে এবং তা দ্রুত বন্যার কারণ ঘটায়। এখানকার কিছু নদী স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং এ সব নদীর মাধ্যমে প্রতি বৎসর নদী তলদেশে এবং নিম্ন অববাহিকায় ব্যাপক পলি সঞ্চয়ন ঘটে থাকে। দক্ষিণ পূর্বের প্রধান নদী কর্ণফুলী ও সাঙ্গু।

(২) প্লায়স্টোসিন যুগের সোপান সমূহ

বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় প্লাস্টোসিন যুগের ভূমিরূপ। এসব ভূমিরূপের মৃত্তিকা লাল।

দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বরেন্দ্রভূমি এবং মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অঞ্চল প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান সমূহের অন্তর্গত।

বরেন্দ্র অঞ্চল সোপান সমূহের গড় উচ্চতা ১৯ থেকে মিটারের মধ্যে অসংখ্য নদীনালা দ্বারা এ সোপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। উচ্চভূমি, লালচে অথবা হলুদাকার কর্দম মৃত্তিকা যা স্থানীয় ভাবে খৈয়ার (Khiyar) নামে পরিচিত। বহু শাখা প্রশাখা সহ অন্ত প্রবাহী (entrenched) নদী এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। বরেন্দ্র ভূমিকে ৫টি ক্ষুদ্রাঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। উত্তর পূর্বাংশের তিনটি আলাদা অংশ তিস্তা নদীর প্লাবনভূমি দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিছু ভূ-চ্যুতি দ্বারা এ অংশটি মূলভূমি হতে বিচ্ছিন্ন এবং গাঢ় লালচে মৃত্তিকায় সমৃদ্ধ; যা লেটেরাইটিক মৃত্তিকা নামে পরিচিত। পুরো অঞ্চলটি প্রায় ১৯৩০.৯০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত। পূর্ব মধ্যভাগের বরেন্দ্রভূমি গড়ে মাত্র ১২ কি. মি. প্রশস্ত। মধ্য পশ্চিম বরেন্দ্র ১৪৫ কি. মি. দীর্ঘ এবং ১৬ থেকে ৩৭ কি. মি. প্রশস্ত। মোট আয়তন ১৭৭০ বর্গ কিলোমিটার। অখন্ড ভাবে এটি দিনাজপুর থেকে পদ্মা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যভাগে ভূমির বন্ধুরতা অধিক। বরেন্দ্রভূমিতে অসংখ্য নিম্নভূমি খাড়ি নামে পরিচিত। পশ্চিম বরেন্দ্রভূমি চারটি আলাদা আলাদা অংশ নিয়ে গঠিত যাদের মোট আয়তন মাত্র ৮১ ব. কি. মি.।

মধুপুর সোপান প্রায় ২৫৫৮ কি.মি. বিস্তৃত এবং ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে ঢালু। উত্তরাংশ উচ্চ টিলার মত চালা নিয়ে গঠিত, যাদের গড় উচ্চতা ৯ থেকে ১৪ মিটার, ডোম আকৃতির এবং অপ্রশস্ত নালা নিয়ে গঠিত, যা বাঁইদ নামে পরিচিত। বাঁইদ গুলো কৃষিকাজে মূলত ঋতুভিত্তিক ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। বাঁইদ গুলো অগভীর ও ডিম্বাকৃতির তলদেশ সম্পন্ন। পশ্চিমভাগ খন্ডিত চালাসমূহ ক্ষুদ্রাকৃতির। নদীগুলো শাখা প্রশাখা যুক্ত। দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্যান্য স্থানের চেয়ে আলাদা। বাঁইদ গুলো প্রায়ই সমতল। পূর্বদিকে অনেক গুলো জলাবদ্ধ বাঁইদ দেখা যায়। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষা নদী দ্বারা মূল মধুপুর সোপান থেকে পূর্বঞ্চলের সোপান অংশ বিচ্ছিন্ন।

সোপানের ভূ-প্রকৃতি কেমন?

(৩) সাম্প্রতিক কালের প্লাবনভূমি

সাম্প্রতিক কালের প্লাবনভূমি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

(৩.১) তিস্তা-পলল পাখা

হিমায়লয় পর্বত মালার পাদদেশে নদী বিধোত হয়ে তেঁতুলিয়া দিনাজপুর অঞ্চলে সঞ্চিত পলল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৯৭-৩৪ মিটার পর্যন্ত উচুঁ। এ অঞ্চলের ঢাল প্রতি কিলোমিটার ০.৯১ মিটার। পুরো অঞ্চলটি ঢেউ খেলানো উচুঁ নিচু। তিস্তা পলল পাখা পূর্বে তিস্তার পশ্চিমে মহানন্দা নদী হতে বগুড়ার শেরপুর পর্যন্ত তিস্তার পুরানো গতিপথ ধরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। উচুঁ পাড় সমৃদ্ধ নীচু জলাভূমি এসব স্থানের বৈশিষ্ট্য, যা বন্যায় প্লাবিত হয়। উত্তরের দিকে ভূমির উপরি ভাগে পলি (Silt), দক্ষিণে নদী পাড় সমূহ বালুকাময় দাঁড়া (diarai) গঠন করে। প্রধান প্রধান নদী সমূহের মধ্যে কুলিক, তিস্ত া, ধরলা এবং দুধকুমার উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণে, বরেন্দ্রভূমির প্লায়স্টোসিন কর্দম এর উপরও এ পলল সঞ্চিত হয়েছে।

তিস্তা পলল পাখার বৈশিষ্ট্য কি?

(৩.২) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা সমভূমি

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মেঘনা নদী বিধৌত প্লাবন সমভূমি বর্ষায় প্রায় ১মিটার পানিতে প্লাবিত হয়।

ভূমিরূপের বৃহত্তম অংশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা সমভূমির অন্তর্গত। তিস্তা পলল পাখা থেকে শুরু করে পদ্মা নদীর উত্তর তীর এবং মেঘনা নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত এ সমভূমি বিস্তৃত। প্লাস্টোসিন যুগের সোপান ব্যতীত পুরা অঞ্চল নদী বিধৌত সমভূমি। এর উত্তর-পূর্বাংশে সিলেটের হাওড় অঞ্চল অবস্থিত। উত্তর প্রান্ত ঘেষে শিলং মালভূমির পাদদেশের টিলাসমূহ এবং এদের মধ্যদিয়ে অসংখ্য স্বল্প বিস্তার সমৃদ্ধ পলল পাখা রয়েছে।

১৭৮৭ সালের পূর্বে যমুনা ব্রহ্মপুত্র নামে পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হত। ফলে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর সমভূমি দেশের উত্তর মধ্য অঞ্চলে সুবিস্তৃত। বাঙ্গালী-করতোয়া প্লাবন ভূমি ও যমুনা-ধলেশ্বরী সমভূমি নিয়ে গঠিত। বর্ষা মৌসুমে পুরো অঞ্চল প্রায় ১ মিটার পর্যন্ত প্লাবিত হয়।

পুরানো ব্রহ্মপুত্র সমভূমি বাহাদুরাবাদ থেকে ভৈরব পর্যন্ত পলল সঞ্চিতির ফলে প্রাকৃতিক বাঁধ গড়ে তুলেছে। এগুলো এখন প্রায় ঋতুভিত্তিক।

মেঘনা সমভূমি মূলতঃ তিস্তা অববাহিকা, মেঘনা-শীতলক্ষা দোয়াব এবং মধ্য-মেঘনা প্লাবনভূমি নিয়ে গঠিত। চাতলাপুর থেকে মেঘনা হতে তিস্তা নদী শাখা হিসাবে বের হয়ে নবীনগরে পুনরায় মিলিত হয়। শীতলক্ষা - বংশাই দোয়াব অঞ্চল নিম্ন ও উর্বর ভূমি। মধ্য মেঘনা অঞ্চলে অসংখ্য চর ও দায়রা আছে। দাউদকান্দী ও ভৈরব বাজারে মধ্যবর্তী অংশে অনেক বৃহৎ চর দেখতে পাওয়া যায়। উজান এলাকায় ভাটি এলাকার চেয়ে স্থায়ী চর পলিক্ষিত হয়।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা সমভূমির বৈশিষ্ট্য কি?
ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ কখন পরিবর্তন হয়?

(৩.৩) হাওড় অঞ্চল

হাওড় সসার আকৃতির নিম্নভূমি, প্রধানতঃ সিলেট এলাকায় দেখা যায়।

হাওড় অঞ্চল মূলতঃ সিলেটের উত্তর পূর্বাংশের পাহাড়ি অঞ্চল ব্যতীত পুরো এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৪৫০৫.২০ বর্গ কি. মি.। সসার আকৃতির নিম্নভূমি গত ২০০ বছরে প্রায় ৯ থেকে ১২ মিটার নিচে ডেবে গেছে। হাওড় অঞ্চলটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ মধ্যভাগ, সুসাং অঞ্চল, মেঘালয়, পাদভূমি অঞ্চল এবং সিলেটের মধ্যভাগের নিম্নভূমি। মধ্যভাগের উচ্চতা সমুদ্র সমতলের কাছাকাছি। এ অঞ্চলে বিল ও হাওড়ের বিন্যাস নদীর বিচ্ছিন্ন অংশ, প্রাকৃতিক বাঁধ, নিচু চর ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। উচু পাড়গুলিকে কান্দা বলে। সুসাং অঞ্চলে সুসাং পাদদেশিয় সমভূমি এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবন ভূমির মাঝখানে নিম্নভূমি আছে যা বন্যার সময় গভীর পানিতে মগ্ন হয়। মেঘালয় পাদভূমির অঞ্চলে রক্ষা নদী থেকে লুবা নদী পর্যন্ত নিম্নাঞ্চল ও হাওড় অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে সর্বনিম্ন ভাগ হচ্ছে টাঙ্গুয়া হাওড় এলাকা। মধ্য সিলেটের হাওড় সমূহের মধ্যে হাকালুকি হাওড় অন্যতম। জুরি ও কুশিয়ারা নদী বাহিত পলি দ্বারা এ হাওড় দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

হাওড়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

(৩.৪) মৃতপ্রায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমানা থেকে মধুমতি দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। এলাকার নদী গুলো শুকিয়ে গেছে।

মৃতপ্রায় গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলটি সম্ভবতঃ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা নদীর মিলিত পলল সঞ্চয়নের ফলে সৃষ্ট একাধিক বদ্বীপের সমন্বয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু করে মধুমতির দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। নদীগুলো বেশীর ভাগই পলিতে ভরাট হয়ে গিয়েছে। বন্যার সময় পদ্মা নদীর বিপুল প্রবাহ এ সব নদী দিয়ে বাহিত হয়। স্বাভাবিক বন্যার চেয়ে প্লাবন ভূমিগুলি উচুঁ, নদী এবং অশ্বক্ষুকৃতির হ্রদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। মৃত্তিকা বালুকাময়। বদ্বীপের মাঝে মাঝে যে বিলগুলো পরিলক্ষিত হয় তা মূলতঃ দ্রুত পলি সঞ্চয়ন এর কারণে সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মধুমতি নদীর প্লাৎদেশের ভূমিতে বিবিধ ভূ-রূপ পরিলক্ষিত হয় যথাঃ অগভীর প্লাবন, গভীর প্লাবন ইত্যাদি। গঙ্গার মূল প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এ অংশে ভূ-গঠন প্রক্রিয়া কার্যকারিতার ও তারতম্য ঘটেছে।

(৩.৫) সক্রিয় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ

সক্রিয় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলটি মধুমতি নদী থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত পদ্মানদীর দক্ষিণ পাড় থেকে উপকূলীয় সমভূমির সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলের নদীগুলো সর্পিলাকার, চর ও দায়ড়া সমৃদ্ধ। বেশিরভাগ চর বালুকাময়, মৌসুমে ১-২ মিটার গভীরতায় প্লাবিত হয়। এখানে জোয়ার ভাটার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অগভীর নিম্নাঞ্চল ও প্রাকৃতিক বাঁধ এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। প্রধান প্রধান নদী সমূহে সংযোগ খাল দেখা যায়। বর্ষাকালে পুরো অঞ্চলেই জোয়ার-ভাটার প্রভাব দেখা যায়।

মৃতপ্রায় ও সক্রিয় গাঙ্গেয় বদ্বীপীয় নদী বৈশিষ্ট্য কি কি?

(৩.৬) ত্রিপুরা সমভূমি

ত্রিপুরা সমভূমি কদর্ম পলি সমৃদ্ধ।

ত্রিপুরা নোয়াখালী এলাকার কর্দম পলি সমৃদ্ধ সমভূমিকে ত্রিপুরা সমভূমি বলা হয়। এ অঞ্চলের নদীগুলো চর্তুঃকোন ভূমিরূপের জন্ম দেয়। প্লাবন ভূমি কিংম্বা বদ্বীপ অঞ্চলের মৃত্তিকা অপেক্ষা এখানকার মাটি লালচে। সমভূমি অঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ পূর্বের পাদদেশীয় ভূমি ও লালমাই পাহাড়, নিম্ন প্লাবন ভূমি এবঙ উচ্চ প্লাবন ভূমি। ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশে লম্বা জালির ন্যায় পাদদেশীয় সমভূমি ২ থেকে ১৫ কি. মি. প্রশস্ত হয়ে ভারতে বিস্তৃত। এই ভূমির মূলগঠন প্লাইস্টোসিন কর্দম কিন্তু পাবর্ত্য বিধৌত বালুকা দ্বারা এটি অচ্ছাদিত। লালমাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৪৬ মিটার। নিম্ন প্লাবনভূমি নবীনগরের দক্ষিণ হতে মাইজদি পর্যন্ত বিস্তৃত, মৌসুমে গোমতি ও ডাকাতিয়া নদীর প্লাবনে গভীরভাবে প্লাবিত হয়। উচ্চ প্লাবনভূমি অগভীরভাবে বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত হয়। এ অঞ্চলের উচ্চভূমিগুলো প্রশস্ত কিন্তু নিম্নভূমি অপ্রশস্ত।

(৩.৭) উপকূলীয় সমভূমি

উপকূলীয় সমভূমির উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩ মিটারেরও কম।

পটুয়াখালী বরিশাল এবং চাঁদপুরের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে উপকূলীয় সমভূমি গঠিত। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার সমান্তরালে সমভূমি অতি স্বল্প প্রশস্ততায় বিস্তৃত। অসংখ্য নদীনালা এখানে জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। নিত্য জোয়ার-ভাটার প্রভাব দেখা যায়, নদী গুলো বেশির ভাগই মোহনায় চর তৈরী করে।

উপকলূীয় নদীর পানি লবণাক্ত। ধীরগতিতে মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রশস্ত মোহনা গুলির মধ্যে হরিন ঘাটা, আগুনমুখা এবং মেঘনা অন্যতম। উপকূলের অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল বালুকা কর্দম যুক্ত, পূর্ব ও মধ্যভাগ কর্দমযুক্ত কর্ণফুলি অববাহিকা এবং সর্বদক্ষিণে মহেশখালি দ্বীপ হতে টেকনাফের শেষ ভাগ পর্যন্ত বালুকাময় তট রয়েছে। উপকূলীয় সমভূমি নদী বহুলতার জন্য ভূখন্ড গুলো দ্বীপের মত অবস্থান করে। বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ গুলি হচ্ছে - হাতিয়া, ভোলা, সন্দীপ ইত্যাদি। দ্বীপগুলির উত্তরাংশ ভাঙ্গন প্রবণ এবং দক্ষিণাংশ গঠন প্রবণ।

উপকূলের নদী সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

চিত্র ৮.২ ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির উপ-বিভাগসহ

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। তম্মধ্যে পাহাড়ী ও সোপান জাতীয় উচ্চভূমি মাত্র ২০ ভাগ জুড়ে আছে বাদ বাকী অংশ সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। সমতল ভূমির বৈচিত্রতা অনেক বেশী। এসব ভূমির কিছু অংশে বছরের অধিকাংশ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে, যেমন- হাওড় অঞ্চল। আবার কিছু অংশ প্লাবিত হয় না। যেমন- মৃতপ্রায় গাঙ্গেয় বদ্বীপ। উপকূলীয় সমভূমি সমুদ্র সমতলের সামান্য উপরে অবস্থিত। সমভূমির প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ ভূমি প্রতি বছর প্লাবিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভারতীয় প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের সহিত সংঘর্ষে কোন পর্বতমালার উত্থান হয়?
ক) কুয়েনলুন পর্বতমালা খ) মেঘালয় পবর্তমালা গ) হিমালয় পর্বতমালা

২। বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়?
ক) ৫টি খ) ৪টি গ) ৩টি

৩। আসাম ও বার্নিজ দ্বীপের মধ্যে কিছু ছোট ছোট দ্বীপ জন্মলাভ করে?
ক) ইয়োসিন যুগে খ) মায়োসিন যুগে গ) প্লায়স্টোসিন যুগে।

৪। বেঙ্গল বেসিনের সবচেয়ে গভীরতম অংশ কোনটি?
ক) কুশিয়ারা অববাহিকা খ) সুরমা অববাহিকা গ) ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা

৫। বাংলাদেশের পূর্বভাগে লালমাই বদ্বীপীয় সমভূমি এবং চান্দিনা সমভূমি -- ।
ক) লম্বাকৃতি খ) চতুর্ভূজাকৃতি গ) অর্ধচন্দ্রাকৃতি

৬। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিতে প্রধান কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ৫টি খ) ৩টি গ) ৮টি

৭। তিস্তা পলন পাখা অঞ্চলে ভূমির ঢাল প্রতি কিলোমিটার কত?
ক) ১.৫ মিটার খ) ০.৫২ মিটার গ) ০.৯১ মিটার

৮। ১৭৮৭ সালের পূর্বে যমুনা ব্রহ্মপুত্র নামে কোন দিকে প্রবাহিত হতো?
ক) পূর্ব দিকে খ) পশ্চিম দিকে গ) দক্ষিণ দিকে।

৯। প্লায়স্টোসিন যুগের সোপান কোন গুলি?
ক) বরেন্দ্রভূমি এবং মধুপুর ও ভাওয়াল গড়। খ) সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়। গ) প্লাবনভূমি।

১০। হাওর অঞ্চলের সর্ব নিম্নভাগ হচ্ছে -- ।
ক) হাইল হাওর খ) হাকালুকি হাওর গ) টাংঙ্গুয়া হাওর

১১। ত্রিপুরা নোয়াখালী এলাকায় কর্দম পলি সমৃদ্ধ সমভূমিকে বলা হয় -- ।
ক) মধ্যভাগের সমভূমি খ) ত্রিপুরা সমভূমি গ) প্লাবন সমভূমি

১২। লালমাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা কত ?
ক) ৪৫ মিটার খ) ৩৫ মিটার গ) ৫৬ মিটার।

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ৩টি অংশের দুটির নাম সক্রিয় ও পরিনত বাকী ১টির নাম _________ ।

২। বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে সংলগ্ন ভারতীয় ৩টি রাজ্যের ২টির নাম আসাম ও ত্রিপুরা বাকী ১টি নাম ________ ।

উত্তরঃ ১। মৃত প্রায় ২। মেঘালয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি?

২। টারশিয়ারী যুগের পাহাড়গুলো সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখুন।

৩। ব-দ্বীপ কাকে বলে?

৪। বাংলাদেশের উপকূলীয় সমভূমির বিবরণ দিন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। চিত্রসহ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দিন।

পাঠ-৮.৩ ঃ অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব বলতে পারবেন
- ☞ মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতির উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব বলতে পারবেন
- ☞ বাংলাদেশের সম্পদ, জনসংখ্যা ও নির্বাচিত দেশের সাথে তুলনা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এ অধ্যায়ে এসব ভূ-প্রকৃতি এদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে তা তুলে ধরা হবে।

বাংলাদেশ প্রধানতঃ কৃষি ভিত্তিক দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতি ও প্রাচুর্যতা সে দেশের কৃষি ও অন্যান্য সমবৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। ভূ-প্রকৃতির যে সমস্ত নিয়ামক আর্থনীতিক কার্যাবলীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো - মাটি, পানি ও জলবায়ু।

বাংলাদেশের ভূমির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ সমতল, শতকরা ১২ ভাগ উচু পাহাড়ী ভূমি এবং তা দক্ষিণ ও উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত। সমতল ভূমির শতকরা ৩০-৪০ ভাগ প্রতিবছর অগভীর থেকে গভীরভাবে প্লাবিত হয়। এসব ভূমি প্রধানতঃ কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। সমভূমির উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ১০-১১ মিটার উচ্চতার অধিক নয়। মৃত্তিকা সাধারনত উর্বর, তবে নাইট্রোজেনের ঘাটতি লক্ষ্যণীয়।

- প্লাবনভূমি বন্যা ও নদী ভাঙ্গন কবলিত হয়।
- ভূমির উচ্চতা, প্লাবন প্রবণতা ও মৃত্তিকার প্রকৃতি দ্বারা শস্যপঞ্জি ও নিবীড়তা গড়ে উঠেছে।

প্লাবনভূমি প্রায়শঃই বন্যা ঝুঁকি ও নদীভাঙ্গনের কবলিত হয়। তাছাড়া, বন্যায়, কৃষিক্ষেতে বালির আস্তরন পড়ে কৃষি ফসলের ও ক্ষেত্রের ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাছাড়া বন্যার কারণে সমভূমিতে গড়ে উঠা জনবসতি, শহর, শিল্প কারখানার প্রভৃত ক্ষতিসাধিত হয়। বন্যায় রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। যেমন, শুধুমাত্র, ১৯৮৮ সালের বন্যায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৫৩টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ৪০ লক্ষ হেক্টর জমির কৃষি ফসল সম্পূর্ণভাবে এবং আরো ৩০ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া, প্রায় ১ লক্ষ গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। যেমন, ৪০টি অধিক বড় ব্রীজ, ৬৪০ কি.মি. রেল লাইন, ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং প্রায় ৬৮ হাজার কি. মি. সড়ক ও কাঁচা রাস্তার ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। এছাড়া, প্রায় ১,০০,০০০ এর অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক বা পুরোপুরি ধবংস হয়। সমভূমির অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাই প্রাকৃতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য। শুস্ক মৌসুমের কৃষি অনেকাংশে কৃষি নির্ভর। দেশের বহু স্থানে এমনকি বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হলে স্বল্প মেয়াদী ধরা হলে কৃষি আবাদের ক্ষতি হয়। ঐতিহ্যগতভাবে কৃষক জমির উচ্চতা, প্লাবন প্রবণতা পানির প্রাপ্যতা ও মৃত্তিকার প্রকৃতির ভিত্তিতে ফসল নির্বাচন করে থাকে। কৃষকের এ ধারণার ভিত্তিতেই স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন শষ্যপঞ্জি এবং ফসলের নিবীড়তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে। যেমন- উঁচু জমিতে ঋতু ভিত্তিক তিন ফসল, মাঝারী জমিতে ২ ফসল এবং নিচু জমিতে ১ ফসলের চাষ করা হয়।

কৃষি ছাড়া ভূ-প্রকতির প্রভাব রাস্তা নির্মাণ, নৌবন্দর ও সমুদ্র বন্দর নির্মাণ শিল্প স্থাপন, জনবসতি গড়ার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ প্লাবনভূমি রাস্তা নির্মাণ ব্যয়বহুল এবং নদী-নালার আধিক্য থাকায় অনেক ব্রীজ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। ফলে নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যায়। তাছাড়া, ব্রীজ বর্ষাকালীণ পানির প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি করে ফলে বন্যা দেখা দেয়।

নির্দিষ্ট সময় ও পরিমাণ মত বর্ষার আগমন ও প্রস্থান এর উপর এদেশের কৃষি নির্ভরশীল

বাংলাদেশের জলবায়ু উপক্রান্তীয় উষ্ণ ও আর্দ্রভাবাপন্ন। এ ধরনের আবহাওয়ার জন্য মৌসুমী বায়ুর প্রভাব লক্ষ্যণীয় যা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসে এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ ঋতুকে বর্ষা বলে। এ সময়ে বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ঘটে থাকে। এ মৌসুমী বায়ুজনিত বৃষ্টিপাত সময়মত, ও পরিমাণমত বাংলাদেশে না আসলে কৃষির মারাত্নক ক্ষতি সাধন হয়। যেমন, মৌসুমী বৃষ্টিপাতের আগমন ৭-১০ দিন দেরী হলে বাংলাদেশের ব্যাপক অংশ খরাক্রান্ত হয়ে ফসলের ক্ষতি হবে এবং আগে আসলে অতিরিক্ত বর্ষণে বন্যার কারণ ঘটবে, তাতে আউশ ও বোরো ফসলে ডুবে যায়।

বর্ষার পরে আসে দীর্ঘ শুস্ক ঋতু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ সময় খুবই কম হয়। এসময়ের কৃষিকাজ পানি প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। যে সব ফসলের জন্য সামান্য পানির প্রয়োজন হয় সেগুলোই রবিশস্য হিসাবে চাষাবাদ করা হয়। তবে রবি ফসলের পরবর্তী ফসল চৈতালী ফসল বা খরিপ-১ মূলত বৃষ্টি বা সেচ নির্ভর। কারণ এ সময় মাটির বর্ষাকালীন আর্দ্রতা শুকিয়ে যায়। তাই শুস্ক মৌসুমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ বা ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে চাষাবাদ সম্ভব হয়। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের

আগমনের ন্যায় এর স্থায়ীত্ব ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মৌসুমী বায়ু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রস্থান ঘটলে উচু এলাকার কৃষিকাজ বিঘ্নিত হয় এবং মৃত্তিকার আর্দ্রতার মাত্রার ভিত্তিতে কি ধরনের রবিশস্য চাষ হবে তা নির্ধারিত হয়।

প্লাবনভূমি ছাড়াও পাহাড়ী ও চত্তরভূমির কৃষি ও মৌসুমী বৃষ্টিপাত নির্ভর। তাছাড়া, এ সমস্ত এলাকার ভূমির ঢাল, মৃত্তিকার গুণাবলী ও স্বল্প গভীরতার মৃত্তিকা ও অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত ও শীতকালীন ঠান্ডা আবহাওয়ায় চা গাছ ভাল হয়। ফলে, সিলেটের পাহাড়ী বনাঞ্চল ও চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে চা বাগান গড়ে উঠেছে। আবার, উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যাপক এলাকা জুড়ে সাগরের লোনা পানি ভিত্তিক লবন চাষ ও জোয়ারের পানি আটকে রেখে চিংড়ি চাষাবাদ গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের একটি মানচিত্র লক্ষ্য করলে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

চিত্রে লক্ষ্য কর, বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক ভূমি ব্যবহার মূলতঃ ভূ-প্রকৃতি নির্ভর। যেমন, সমতল ভূমিতে (১) একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে কিন্তু উপকূলীয় ভূমিতে লবনাক্ততার কারণে শুধুমাত্র ১টি ফসল করা যায়। একইভাবে বরেন্দ্রভূমিতে ও বৃষ্টিপাত নির্ভর হওয়ায় ১টি ফসল চাষ সম্ভব হয়। সিলেটের হাওড় অঞ্চলে শুধুমাত্র বোরো চাষ সম্ভব কিংবা টিলাগুলোতে চা ও ফল বাগানের আবাদ সম্ভব হচ্ছে। তবে, আশা করা যায় ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ যত বেশী অকৃষি অর্থাৎ শিল্পের কারখানা গড়ে তুলতে পারবে ততই এ নির্ভরশীরতা হ্রাস পাবে।

৮.৩.১ বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতির উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

পূর্ববর্তী পাঠে ভূ-প্রকৃতি কিভাবে অর্থনীতিক কার্যাবলীতে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ভূ-প্রকৃতি এদেশের জীবনধারা ও সংস্কৃতির ওপর যে প্রভাব ফেলে তা জানতে পারবেন।

সভ্যতার আদিকাল থেকেই ভূ-প্রকৃতি মানুষের জীবন সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। ভূ-প্রকৃতির যে সমস্ত নিয়ামক এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ন তা হলো- জলবায়ু ও ভূমিরূপ। একটি দেশের জলবায়ু ও এর ভূমিরূপ সে দেশের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জোগায়। এ দেশের মানুষের জনবসতির ধরন, নির্মান কৌশল ও সামগ্রী, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, কৃষি ব্যবস্থা এর প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক প্রভাব, বিশেষত জলবায়ু ও ভূমির উপযোগিতা সবচেয়ে লক্ষ্যনীয়।

> জলবায়ু ও ভূমির উপযোগিতা বসতির ধরন, স্থান নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে ২টি প্রধান ভাগ করা যায়- সমতল ও পাহাড়ী ভুমি। সমতল ভূমির ৩০-৪০ শতাংশ প্রতি বছর বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয় এবং তা ৩ থেকে ৬ মাসের অধিক পানিতে নিমজ্জিত থাকে। বাকী সমতল ভূমির প্রায় ৮ ভাগ বন্যায় প্লাবিত হয় না; যা চত্বরভূমি নামে পরিচিত। পাহাড়ী ভূমি যদিও সমভূমির ন্যায় বন্যায় প্লাবিত হয় না তথাপি বর্ষাকালীন অতিবর্ষন জনিত পাহাড়ী ঢলে প্রায়শঃ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্রের ন্যায় বাংলাদেশের জলবায়ুতে তেমন লক্ষ্যনীয় পার্থক্য না থাকলেও বৃষ্টিপাতের মোট পরিমান, উষ্ণতা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার তারতম্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ভাবে ৪টি প্রধান এলাকায় ভাগ করা যায়। যথা- দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাংশের অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল আর্দ্র অধিক শীতল অঞ্চল; উত্তর- পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত শুস্ক উষ্ণ অঞ্চল যা যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা নদী দ্বারা সীমায়িত, দক্ষিণ-পশ্চিমের গঙ্গা বদ্বীপের মৃদু শুস্ক ও উষ্ণ অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় মাঝারীভাবাপন্ন অঞ্চল।

ভূমিরূপ ও জলবায়ুগত নিয়ামক সমূহ ঐতিহ্যগত ভাবে এদেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রায়, বিশেষতঃ জনবসতি, খাদ্য, পোশাকে, পেশা, কৃষি ব্যবস্থায় অপরিসীম প্রভার ফেলেছে। নিম্নে এসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হলো।

> নদী তীরবর্তী ঘরবাড়ীর ভিটা অনেক উচু করা হয়।

বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে যে সব জনবসতি গড়ে উঠেছে সেগুলির ধরন, স্থান নির্বাচন, নির্মান সামগ্রী বেশ উল্লেখযোগ্য। যেমন- নীচু এলাকায় অর্থাৎ সমতল ভূমির যেখানে বৎসরের অধিকাংশ সময় বর্ষার পানিতে নিমজ্জিত থাকে। সেখানে নদীর তীর বরাবর অনেক উচু করে ভিটা প্রস্তুত করে বাড়ী প্রস্তুত করা হয়। ভিটার উচ্চতা সাধারনতঃ স্থানীয় বন্যার পানির উপরে নির্মান করতে হয়। এসব এলাকার বাড়ীঘর অনুকেন্দ্রিক হয়। অন্যান্য সমতল ভূমির বসতি সমূহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সারিবদ্ধ আকৃতির হয়। কারন, অধিবাসীগন নদী তীরবর্তী উচুঁ জায়গা বসতির জন্য নির্বাচন করে থাকে। তাছাড়া, নদী তীরবর্তী হওয়াতে যোগাযোগ ও সহজ হয়। নৌকার মাধ্যমে নদীতে যাতায়াত সহজ হয় এবং নদীতে মাছ ধরার সুযোগ থাকায় অনেকই পেশা হিসাবেও তা নেয়। তবে, সমতল ভূমি নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়ার পর পূরানো জনপদ থেকে যায় এবং সময়ের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবসতি অনুভূমিক ভাবে বিভিন্ন দিকে সমপ্রসারিত হয়। ফলে, তা আর সারিবদ্ধ না থেকে এর কিছু অংশ গুচ্ছাকৃতিতে রূপ নেয়। বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায় নদী ভিত্তিক তাদের কার্যক্রম

> সমতল ভূমির জনবসতির ধরণগুলো কেমন?

চালিয়ে যায়। কোন ভূমিতে জনবসতি স্থাপন না করে নৌকায় বসবাস করে। এ সম্প্রদায়ের লোকজন গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বিভিন্ন ব্যবসার কাজে নিয়োজিত থাকে।

বরেন্দ্র ও মধুপুরে মাটির ঘরবাড়ি দেখা যায়।

আবার, সমতলভূমির উপকূলীয় অংশে ভূমি ঢাল খুবই কম থাকায় এবং বন্যার আংশকা না থাকায় ঘরবাড়ী ছড়ানো হয় এবং তা ভূমির সমতলে গড়ে উঠে। নির্মান সামগ্রীতে স্থানীয় কর্দমাক্ত মাটি দিয়ে ঘর নির্মান করা হয়। ঘরের চাল নির্মানে ছন বা গোলপাতার ছাউনি ব্যবহার করা হয়। মাটির ঘর বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুরগড় এলাকাতে দেখা যায়। তাছাড়া কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোহর এলাকায় ও মাটির ঘরবাড়ী প্রচলিত আছে।

পাহাড়ী এলাকার বাড়ীঘর ছড়ানো বা বিক্ষিপ্ত এবং বেশীর ভাগ কাঠের বা বাঁশের পাটাতনের উপর। বন্য প্রানীর আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য বা অনেকে আকস্মিক বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খুটির উপর ঘর নির্মান করে থাকে। সিলেটের খাসিয়া বা মেথেলগন মাটির দেয়াল ও উঁচু ভিটা বিশিষ্ট ঘরে বসবাস করে। রাংগামাটি বান্দরবন ও খাগড়াছড়িতে বসবাসরত বহু উপজাতি বিশেষতঃ কুকি, টিপরা, চাকমা, মিজো, মারমাগন উচু পাটাতনের উপর ঘর নির্মাণ করে থাকে।

ইউনিট- ১৭ এ বাংলাদেশের গ্রামীন বসতির ধরন বিন্যাসের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ চিত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় যে নদীকূলবর্তী জনপদ সারিবদ্ধ হলেও সমতল ভূমির বিস্তৃত অংশ বেশীর ভাগ বসতি বিক্ষিপ্ত। আবার পাহাড়ী বসতি বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত হাওড় ও বিল অঞ্চলের বসতি অনুকেন্দ্রিক।

জনবসতি ছাড়াও কৃষি ব্যবস্থা দেখা যায় যে সমতলভূমির অধিবাসীগন অধিকাংশই কৃষি নির্ভর এবং তা ধান ভিত্তিক। অপরদিকে, পাহাড়ী এলাকায় জুম চাষ পদ্ধতি, ফলের চাষ বা তরকারী/ আনাজ এবং অকৃষি পেশা বিশেষতঃ বয়ন কাজের আধিক্য বেশী। সমতল ভূমির লোকের পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস ও পাহাড়ীদের চেয়ে ভিন্ন। সমভূমির লোকজন প্রধানত ভাত-মাছভোজী এবং পুরুষরা লূঙ্গী ও শার্ট পরিধান করে থাকে, মহিলারা শাড়ী- ব-াউজ পরিধান করে, তবে হিন্দুরা ধুতী পরিধান করে। পাহাড়ী এলাকার উপজাতীয়গন ভাত, রুটি, মাছ-শুকরের মাংস মসলাযুক্ত সবই খায়; মহিলারা লুঙ্গি ও ব-াউজ পরিধান করে থাকে এবং পুরুষরা লুঙ্গি শার্ট পরিধান করে।

পাহাড়ী এলাকার চাষ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি কি?

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষি ভূ-প্রকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ জলবায়ু, পানি ও মৃত্তিকার ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, রাস্তাঘাট, শিল্প স্থাপন ও জনবসতির স্থান নির্বাচনে ও ভূ-প্রকৃতির অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্যনীয়। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, যেমন- নৌ ও সমুদ্র বন্দর নির্মাণে ও ভূ-প্রকৃতির গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ভূমিরূপ ও জলাবায়ু এদেশের জীবন ধারা ও সংস্কৃতির উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এদেশের গ্রামীণ বসতির ধরন ও গঠনে জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্যনীয়। তাছাড়া, কৃষিচাষ পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস পোষাক পরিধানেও এ প্রভাব সুস্পষ্ট।

৮.৩.২ ঃ বাংলাদেশের সম্পদ, জনসংখ্যার অনুপাত এবং নির্বাচিত দেশের সাথে তুলনা

পাঠের শুরুতেই আমরা আজ বাংলাদেশের সাথে জনসংখ্যার ও সম্পদের একটি তুলনা চিত্র তুলে ধরতে চাই। একই সাথে প্রতিবেশী দেশ সমূহের আলোকে বাংলাদেশের সম্পদের তুলনা এ বিষয়ে আমাদের আপেক্ষিক অবস্থান জানতে সহায়ক হবে। তাহলে আসুন আমরা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করি।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের ১৬,০০,০০,০০০ প্রায় লোক বসবাস করায় দেশটি পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম (৭৭৫ জন প্রতি বর্গ কি.মি.)। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় এদেশেরও অর্থনীতি অত্যন্ত দূর্বল। এদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) মাথাপিছু আয় কম এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার;
(খ) স্বল্প শিক্ষার হার এবং নিম্ন মাত্রার সাধারন শিক্ষা;
(গ) প্রাচীন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ও জমির স্বল্প উৎপাদন মাত্রা;
(ঘ) খনিজ সম্পদের স্বল্পতা এবং স্বল্প সংখ্যক শিল্পকারখানা;
(ঙ) অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং

(চ) বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপক ঘাটতি।

এসব সমস্যা স্বত্বেও বাংলাদেশে স্বাধীনতার শুরু থেকেই এদেশের সম্পদের চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের সম্পদ বলতে এদেশের কৃষিভূমি, বনজ সম্পদ, পানি, খনিজ ও মানব সম্পদ বুঝানো হয়। এসব সম্পদ এখনও পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার সম্ভব হয় নাই। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রায়শঃ মারত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়; এর ফলে মানব সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ উন্নয়নের কর্মকান্ড বাঁধাগ্রস্থ হয়। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ এসব সম্পদ উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। নিম্নে এসব সম্পদের উপর আলোকপাত করা হলো।

কৃষি সম্পদ

দেশের জিডিপি এর শতকরা ৫৭ ভাগ কৃষি থেকে আসে।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের মাত্র ১২ ভাগ পাহাড়ী ও উচুঁভূমি, বাকী অংশের জলাভূমি ও বসতি ব্যতীত প্রায় পূরো অংশই চাষাধীন। দেশের চাষ যোগ্যভূমির পরিমান মোট ভূমির প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ। দেশের জিডিপি -এর প্রায় ৫৭ ভাগ কৃষি থেকে আসে এবং শ্রম শক্তির প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত যা প্রতিবেশী দেশ ভারতের অনুরূপ (৬৫%)। এদেশের উষক্স আর্দ্র জলবায়ু ও হালকা, সংক্ষিপ্ত শীতকালের কারণে বিভিন্ন ধরনের ফসলাদি উৎপাদন সম্ভব হয়। ফসল উৎপাদনের প্রধানতঃ তিনটি ঋতু আছে।

(ক) রবি - যা নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত থাকে;

(খ) খরিপ-১ / চৈতালী, মার্চ-এপ্রিল থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত;

(গ) খরিপ-২ / ভাদুই, জুলাই-আগষ্ট থেকে নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত।

রবি মৌসুমে শাক-সবজি ছাড়াও ব্যাপকভাবে সরিষা, আলু, গম, বাদাম, মরিচ, বোরো ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। খরিপ-১ মৌসুমের প্রধান ফসল আউশ, পাট, তিল, কাউন, চীনা, মিষ্টি আলু, পেয়াজ, রসুন, মরিচ ও উচ্চ ফলনশীল ধান। খরিপ-২ বা ভাদুই মৌসুমের প্রধান ফসল আমন ধান ও ইক্ষু। বনজ সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ সমূহের তুলনায় অনেক পিছনে রয়েছে। মাথাপিছু বনভূমি নেপালীদের সর্বোচ্চ (প্রায় ১২০০ বর্গ মি.) এর পরই শ্রীলঙ্কানদের (প্রায় ১০২৭ বর্গ মি.)। বাংলাদেশের অধিবাসীদের বনভূমির মাথাপিছু হার মাত্র ৯৯ বর্গ মি.। এদেশের প্রধান বনভূমি উপকূলীয় সুন্দরবন যার মোট আয়তন প্রায় ৬০০০ বর্গ কি.মি.। এর বৃহৎ অংশই বাংলাদেশের আওতাভূক্ত এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামেই বাংলাদেশের প্রধান বনভূমি রয়েছে। মধুপুর বনাঞ্চল নামে গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের কিয়দংশে ও বনভূমি আছে। তবে এসব বনভূমি একত্রে মোট ভূ-ভাগের ৯ ভাগের ও কম (১৯৭০ বর্গ কি.মি.)।

বাংলাদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

পানি সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায় মন্দ নয়। বিশ্বের প্রধান নদী সমূহের তিনটি গঙ্গা-পদ্মা, ব্রক্ষপুত্র-যমুনা ও মেঘনা বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এসব নদীর অনেক শাখা-প্রশাখা নিয়ে এদেশে একটি বিস্তৃত নদী জাল গড়ে উঠেছে। এদেশে প্রায় প্রতি ১০ কি.মি. এর মধ্যেই একটি বড় নদী পাওয়া যায়। নদীর এ প্রাচুর্য সত্ত্বেও এদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, বর্ষায় দেশের প্রায় শতকরা ৩০-৪০ ভাগ অংশ প্লাবিত হয় এবং প্রায়শঃই বন্যা কবলিত হয় অপরদিকে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব দেখা দেয়, ফলে কৃষি কাজে ব্যাঘাত ঘটে। সে সময় অনেক ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভর করতে হয়। এদেশে মোট নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০ এর অধিক যা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৪,১৪০ কি.মি.। এসব নদীর পানি কৃষিকাজে, পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য আহরনে, নৌপরিবহনে, গৃহস্থালী ও শহরে পানি সরবরাহের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। নদী ছাড়াও বেশ কিছু জলাভূমি আছে যার অধিকাংশই হাওড়, বিল ও বাওড় নামে পরিচিত। এসব জলাভূমি মিঠা পানির মৎস্যের অন্যতম উৎস এবং শুষ্ক মৌসুমে এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোরো ধানের চাষ হয়ে থাকে। খনিজ সম্পদ বলতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসই প্রধান উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এছাড়া, কাঁচ, বালি সাদাকর্দম, চুনাপাথর, ভারী খনিজ কয়লা, স্বল্পমাত্রায় পাওয়া গেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ বর্তমানে পেট্রো-রাসায়নিক শিল্পে বিশেষতঃ সার, কৃত্রিম সূতা, প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ তৈরীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, সিমেন্ট কারখানায় অন্যান্য শিল্প কারখানায় গৃহস্থালীর রান্নার জ্বালানী কাজে ও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের তুলনায় খনিজ সম্পদে ভারত ও পাকিস্তান অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী। এ দুটো দেশেই উন্নতজাতের কয়লা, লৌহ আকরিক, বক্সাইট আকরিক থাকায় সস্তা পানি বিদ্যুতের সাহায্যে এসব আকরিক

দেশে নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০ এর অধিক এদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ-প্রাকৃতিক গ্যাস।

প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক কি কি শিল্প গড়ে উঠেছে?

ব্যবহারের মাধ্যমে উভয় দেশেই ভারী শিল্প কারখানা যেমন- লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় নিজস্ব কাঁচামালের অভাবে বাংলাদেশে এ ধরনের ভারী শিল্পকারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই অনগ্রসর বয়ে গেছে। তবে স্থানীয় ও কাঁচবালি, সাদাকদম ব্যবহার করে এদেশের উন্নত মানের চীনা মাটির তৈজষপত্র শিল্প গড়ে উঠেছে যার উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

মানব সম্পদ

প্রতিবেশী দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ মুসলমান এবং ১৬ ভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত এবং বাকীরা ৮ খ্রীস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এদেশের শিক্ষার হার শতকরা ৬০ ভাগ পাকিস্তানের সমান হলেও ভারত (৫২%) ও শ্রীলংকার (৯০%) তুলনায় অনেক কম। প্রত্যাশিত বয়সের (Life expectancy) ক্ষেত্রে পাকিস্তানে (পুরুষ-৫৮ ও মহিলা ৫৯ বছর) এবং ভারতের (পুরুষ ৫৯ ও মহিলা ৬০ বছর) চেয়ে বাংলাদেশ (পুরুষ ও মহিলা ৫৬ বছর) সামান্য পিছিয়ে থাকলেও শ্রীলংকার (পুরুষ ৭০ বছর এবং মহিলা ৭৫ বছর) তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশই যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের তুলনায় ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের জনসংখ্যার কিছু বৈশিষ্ট্যবলীর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.৬.১ এ দেখোনো হলোঃ

সারণি ৮.৩.১ ঃ বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকার জনসংখ্যার নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যবলীর ও পাকিস্তানের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	বাংলাদেশ	ভারত	পাকিস্তান	শ্রীলংকা
জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গমাইল	২১৬০ জন	৭৭৯	৩৮১	৭৩২
শিক্ষার হার (%)	৬০	৫২	৩৮	৯০
জন্মহার (প্রতি হাজারে)	৩১	২৬	৩৬	১৮
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	১১	১০	১১	৬
জন সংখ্যা বৃদ্ধি (%)	১.৯	১.৬	২.৫	১.২
শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার)	১০২	৭১	৯৭	২১
হাসপাতাল শয্যা	৩২১৮ জনে ১টি	১৩৫৭ জনে ১টি	১৭০২ জনে ১টি	৩৬২ জনে ১টি
শ্রম শক্তি				
কৃষি (%)	৬৫	৬৫	২৭	৪৫
শিল্প ও খনি (%)	১৪	-	-	১৩
চাকুরী (%)	২১	-	৩২	-

উৎস ঃ World Almanac, 1997.

উপরে সারণি ৮.৩.১ এ উল্লেখিত জনসংখ্যার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিবেশী দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। তবে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিরতা বজায় থাকলে আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যৎ এ বাংলাদেশ এসব ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশে বাড়তি জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। গত ১৯৮০ এর দশক থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মালয়েশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্টথ ও ইউরোপের কিছু কিছু দেশে বাংলাদেশের দক্ষ শ্রমিক ও অন্যান্য পেশার বিপুল সংখ্যক লোক কাজ নেয়। বিদেশে তাদের উপাজিত অর্থ বাংলাদেশে প্রেরণ করে থাকে যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির একটি অন্যতম অংশ।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশের সম্পদ বলতে এদেশের মাটি, জলবায়ু, কৃষি, পানি ও জনগোষ্ঠিকে বুঝায়। এদেশের বিপুল জনগোষ্টির তুলনায় সম্পদ সীমিত। প্রতিবেশী দেশগুলোর তূলনায় প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। আশা করা

যায় অদূর ভবিষ্যতে দেশের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবেশীর তুলনায় আমাদের অনগ্রসরতার মাত্রা কমনো যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৮৮ সালের বন্যায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে কয়টি জেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়?
ক) ৪২টি খ) ৫৩টি গ) ৬২টি

২। চৈতালী ফসল কোনটি -- ।
ক) খরিপ-১ খ) খরিপ-২ গ) খরিপ-৩

৩। সমভূমির উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে কত মিটার উচ্চতার অধিক নয়?
ক) ১০-১১ মিটার খ) ৮-৯ মিটার গ) ১৫-১৫ মিটার

৪। মাঝারি জমিতে ঋতুভিত্তিক কয়টি ফসল হয়?
ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি

৫। প্লাবনভূমি কি কারণে ঝুঁকিপূর্ণ?
ক) বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের জন্য খ) ভূমিকম্পের জন্য গ) বালির স্তরের জন্য

৬। সমতল ভূমির কত শতাংশ প্রতি বছর পানিতে প্লাবিত হয়?
ক) ২৫-৩০ খ) ৩০-৪০ গ) ৪২-৪৫

৭। উষ্ণতা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার ভিত্তিতে আঞ্চলিক ভাবে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়?
ক) ২টি খ) ৪টি গ) ৬টি

৮। মাটির ঘর কোথায় দেখা যায়?
ক) বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর অঞ্চল খ) টারশিয়ারী পাহাড় অঞ্চল গ) প্লাবন ভূমি অঞ্চল।

৯। নৌকায় বসবাসকারী সম্প্রদায়ের নাম --- ।
ক) বেদে খ) সাওতাল গ) মগ

১০। বাংলাদেশের লোক সংখ্যার ঘনত্ব কত?
ক) ৭৫০ জন খ) ৭৭৫ জন গ) ৭৮০ জন

১১। বাংলাদেশের শ্রম শক্তির কতভাগ কৃষিতে নিয়জিত?
ক) ৬০ ভাগ খ) ৬৪ ভাগ গ) ৭০ ভাগ

১২। নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী-মার্চ পর্যন্ত কেন কৃষি ঋতু?
ক) রবি খ) খরিপ-১ গ) খরিপ-২

১৩। বাংলাদেশের মাথাপিছু বনের পরিমান কত ব.মি?
ক) ৯৮ ব. মি. খ) ৯৯ ব. মি. গ) ১০০ ব. মি.

১৪। বাংলাদেশের নদী গুলির মোট দৈর্ঘ্য কত?
ক) ২৩,১৪০ খ) ২৪,১৪০ গ) ২৫,১৪০

১৫। বাংলাদেশের জনসংখ্যার কতভাগ মুসলমান?
ক) ৮০ ভাগ খ) ৮৩ ভাগ গ) ৮৪ ভাগ

১৬। বাংলাদেশের জনসংখ্যার কতভাগ হিন্দু?
ক) ১৫ ভাগ খ) ১৬ ভাগ গ) ১৭ ভাগ

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যবলীর উপরে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের আলোকে মানুসের সংস্কৃতির উপরে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট আলোচনা করুন।

৩. বাংলাদেশের সাথে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখুন।